Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XV Issue : XI 15th, February, 2026 ১লা ফাল্গুন, ১৪৩২, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

নতুন বছরের দ্বিতীয় মাস কত না বিষয় মনের মধ্যে দোলা দেয়। কোনটা ছেড়ে কোনটা মনের ঠিকানায় স্থান দেব— সেটাই ভাবার। বিদ্যা আরাধনার পূজা, বইমেলা বা ভাষা আন্দোলন ২১ ফেব্রুয়ারি যা বিশ্বের দরবারে একটি রাষ্ট্রের সম্মান এনে দিয়েছে— যা বাঙালির গর্ব। আমরা আমাদের জীবনে যাপন করতে পারি— ভালো বন্ধু, ভালো বই আর ভালো সঙ্গী— এই হলো একেবারে আদর্শ জীবন।

অর্ধ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলে অস্তিত্বসঙ্কট আশ্চর্য নয়। ৪৯তম বইমেলা হয়তো আবারও কিছু গভীর ও গম্ভীর অস্তিত্বমূলক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে পাঠক, লেখক ও প্রকাশকদের। তার বাইরে যে সমাজ এখনও মুদ্রিত বইপাঠের জগৎ এবং বিশেষ ভাবে বাংলা বইপত্রের জগৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন, তাঁদেরও। বইমেলার হইহই প্রতি বছরের মতোই মহানগর জুড়ে এক আনন্দমুখরতা নিয়ে আসে, সেখানে উপস্থিত হন রাজ্যের ও দেশের অন্যান্য অংশের উৎসাহীরাও। প্রতি বছরের মতোই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, মেলার যে বিপুল লোকসমাগম, তার একটি বড় অংশ নিশ্চয় বই কেনা, নিদেনপক্ষে বই দেখার জন্যই।

কিছু সমালোচক খুঁতখুঁত করে বলবেন, ভিড়ের পরিমাণ আর বই কেনাবেচার পরিমাণের মধ্যে তুলনাটি মোটেই সন্তোষজনক নয়। বইমেলা যখন ব্যবসার বিষয়, তখন লভ্যাংশের মাত্রাই উদ্যোগের মানের পরিচায়ক হওয়া উচিত, এমন অন্যথা সঙ্গত যুক্তিও তিনি দেবেন। তাকে পাল্টা মনে করানো যেতে পারে, কলিকালে কানামামাকেও যত্নআত্তি করা জরুরি। আবার জরুরি হল, বাংলা ও অন্য ভাষার সমান্তরাল বিশ্বকে, ছাপা বই আর ই-বইয়ের সহযাত্রাকে প্রসন্ন স্বীকৃতি দিয়ে, তার গুরুত্বকে সম্মান দিয়ে বইমেলাকে কীভাবে তরুণ প্রজন্মের কাছে আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সে বিষয় নিয়ে ভাবা দরকার।

বইয়ের জগৎটা বেশ রোমাঞ্চকর। এক কালে শ্রুতি-স্মৃতির কালে মানুষ শুনে শুনে মনে রাখত আর তা বলে বলে অন্যকে শোনাত, সেভাবেই প্রবাহিত হয়ে চলত মানুষের সারস্বত সাধনা। কলকাতা বইমেলার সূত্রপাত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বইমেলাকে কেন্দ্র করেই কলকাতা তথা বাঙালির জীবনে একটা উন্মাদনা এল, যে-কারণে অনেকে একে বই-পার্বণও বলতে শুরু করলেন, যেমন বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই মেলাকে উপলক্ষ করেই প্রকাশকরা বইপ্রকাশ করা শুরু করলেন। আগে মূলত পয়লা বৈশাখেই প্রকাশকরা বই প্রকাশ করতেন, কিন্তু বইমেলা প্রকাশনার সময়ের সে অভিমুখ ঘুরিয়ে দিল। পাশাপাশি শুরু হল গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান, কবিতা পাঠ, বই নিয়ে আলোচনা সভা ইত্যাদি। এক কথায় বইয়ের বিপণন ব্যবস্থাপনার এই উদ্যোগ বাংলার সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠল।

একটা সময় বেশ কিছুকাল হয়েছিল "বইয়ের জন্য হাঁটুন" নামে পদযাত্রা। বিপুল উৎসাহ ও সাড়া পাওয়া গিয়েছিল সেই পদযাত্রায়। বিশেষ করে শিশুদের যখন আক্রমণ করছে মোবাইল— তার হাত থেকে বাঁচাতে বই তুলে দিই আর সব অনুষ্ঠানের ফিরে যাই বই উপহারে— এই হোক আজকের কর্তব্য।

Vol : XV Issue : XI, 15th, February, 2026, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2025-27

চলুন যাই পিকনিকে বেথুন টু সোনারপুর

জি এম আবুবকর

শীতকালে পিকনিক মানে একটি দিন দৈনন্দিন জীবন থেকে মুক্তি। হালকা পায়ে ঘোরাঘুরি, বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্য লাভ, নতুন নতুন সম্পর্ক রচনা। আর খানাপিনা তো থাকেই অঢেল। তার সঙ্গে যোগ হয় তা-পা ছাড়ানোর মতো খেলাধুলো, গান-আবৃত্তি— কতো কথার কচকচি। সোনারপুর ওই তো দেখা যাচ্ছে। বেথুন থেকে আমরা যাবো ট্যুরিস্ট বাসে। তাছাড়া, ঘন ঘন ট্রেন আছে, অজস্র বাস মিনিবাস অটো টোটো তো আছেই।

এককালে সোনারপুর-এর বোড়াল এলাকা ছিল বির্ধষ্ণু অঞ্চল। পরবর্তীকালে এলাকার নাম পরিবর্তন হয়ে দাঁড়া ঋষি রাজনারায়ণ। নবজাগরণের অন্যতম অগ্রপথিক রাজনারায়ণ বসুর বাড়ি ছিল এখানে। তিনি পায়ে হেঁটে কলকাতায় যাতায়াত করতেন। এই এলকা শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় এতটাই অগ্রসর ছিল যে লোকে বলতো— বোড়াল হলো "দক্ষিণের নবদ্বীপ"। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী ফিল্মের শ্যুটিং করেছিলেন বোড়ালের পূর্ব নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। এখনো রাস্তার মোড়ে তাঁর একটি আবক্ষমূর্তি স্থাপন করা আছে। কাছাকাছি এলাকায় আছে ঐতিহ্যবীহী ত্রিপূরেশ্বরী মন্দির।

সেকালে আদি গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হতো বৈষ্ণবঘাটা, গড়িয়া, রাজপুর, হরিনাভী, কোদালিয়া, মালঞ্চ, মাহিনগর, বারুইপুর, দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর মজিলপুর ইত্যাদি নিম্ন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অঞ্চল দিয়ে। পুরোনো কালে কলকাতায় আসার একমাত্র পথ ছিল এই আদি গঙ্গার জলপথ শ্রীচৈতন্যদেব এই পথ ধরে গিয়েছিলেন নীলাচলে অর্থাৎ উড়িষ্যার পুরী। বাংলার নবজগরণ কালে বহু বিখ্যাত মানুষের পদার্পণ ঘটেছিল এইসব এলাকায়। রজনী পাম দত্ত— যিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা— এখানে এসেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ তল্লাটে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বারুইপুর কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট। শোনা যায়, একবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিস্টার বেশে বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর এজলাসে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, সি ভি রমন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো না কোনো সময়ে বা একাধিকবার কোনো কার্যোপলক্ষে এই এলাকায় পদার্পণ করেছেন। এই এলাকায় যাতায়াত ছিল কীটপতঙ্গের গবেষক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যর।

বাংলার কীটপতঙ্গ গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে। তাঁর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি সভা হয়েলি রবীন্দ্রসদনে। পঁচিশে বৈশাখের দিনের অনুষ্ঠানে তিনি খোলাখুলি জানিয়েছিলেন কীভাবে কীটপতঙ্গর জীবন প্রণালী জানার জন্য তিনি দিনের পর দিন তাদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতেন।

সৌভাগ্য বলে কথা— সেই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন দ্বারকানাথ

বিদ্যাভূষণের ভাগিনেয়। তিনি থাকতেন মামার বাড়ি চাঙড়িপোতায়। পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন হরিনাভী অ্যাংলো-স্যাঙস্কৃট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষকরা ছিলেন এই এলাকার বাসিন্দা। বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন হরিনাভী স্কুলের শিক্ষক। তিনি সপরিবারে স্কুল কম্পাউন্ডে বাস করতেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন মাহিনগরের বসু বংশের সুসন্তান। কোদালিয়া গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়ি আজো আছে এবং সেখানে নেতাজীর জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়।

সোনারপুর অন্নপূর্ণা সিনেমাহলে আমি ফিল্ম ডিরেক্টর মৃণাল সেনের সম্বর্ধনা সভায় হাজির থেকেছি। সজল রায়চৌধুরী ছিলেন রাজপুর বাংলা স্কুলের পোশাকি নাম রাজপুর বিদ্যানিধি স্কুল-শিক্ষক। তিনি অভিনেতা হিসেবে নামজাদা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রেবা রায়চৌধুরীও ভালো অভিনেত্রী ছিলেন। উভয়েই মৃণাল সেনের বহু ফিল্মে অভিনয় করেছিলেন। মূলত সজল রায়চৌধুরীর প্রচেষ্টায় তাঁর স্কুলের পক্ষ থেকে ওই বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টরকে সম্বর্ধনা ও ফিল্ম শোর আয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে রথতলায় ভাস্করভবন। এদেশের প্রখ্যাত ভাস্কর, চিন্তামণি করের বাসস্থান এখন দেশের অন্যতম শিল্প সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে। তাঁর খ্যাতনামা সহধর্মিনী আমিলা আহমেদ করের নামেও আছে আর্ট গ্যালারী। চিন্তামণি করের জন্মদিনে এখানে প্রতি বছর আর্ট উৎসব হয়। আমি সেই শিল্পী সমাবেশে সময় করে যাই। ভাস্করভবনের পাশে আছে একটি কৃত্রিম অরণ্য। এখানে অজস্র রকমের বৃক্ষ-লতাদি আছে, বহু ধরণের পাখী আছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এখানে বসে নিশ্চিন্তে আড্ডা দেয়, পিকনিক করে। এই কৃত্রিম অরণ্যের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মজে যাওয়া আদি গঙ্গা।

ব্যক্তিগতভাবে সোনারপুর আমার কাছে খুব স্মৃতিবহ। চুয়াত্তর থেকে ঊনআশি আমি কর্মসূত্রে ছুটে বেড়িয়েছি সোনারপুর, রাজপুর, হরিনাভী, গড়িয়া, নরেন্দ্রপুর। বলা যায়, চষে বেড়াতাম সারা দক্ষিণ ২৪ পরগণার ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত।

পরবর্তীকালে গাজীপুর গিয়েছি প্রতি সপ্তাহে, আমার কন্যাকে টিউটোরিয়াল ক্লাসে নিয়ে যেতাম। এই গাজীপুর-কোদালিয়া গ্রামে জন্মেছিলেন স্বনামধন্য সঙ্গীত প্রতিভা সলিল চৌধুরী। এখনো সময় পেলে ওই সব অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করি। বিখ্যাত বোসপুকুরের ধারে ছিল বিডিও অফিস। তারই পাশে একটি দোতলা বাড়ির ওপরে ছিল আমার অফিস। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরেছি আশেপাশের বিখ্যাত জায়গাগুলি।

বর্তমানে সুভাষগ্রাম স্টেশনের কাছে প্রাচীন চাঙড়িপোতা। সেখানে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসগৃহ। সেকালের আধুনিকতম বাংলা সংবাদপত্র "সোমপ্রকাশ" ছাপা হতো ওই বাড়ি থেকে। তখনো রেল চলেনি, সম্পাদক দ্বারকানাথ সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় যাতায়াত করতেন। চাঙড়িপোতা থেকে কোদালিয়া— সেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাড়ি— এখনো যথারীতি বিদ্যমান। রাজপুরের লাহিড়ীপাড়ায় শতবর্ষিয়ান নিভাননী লাহিড়ীর সঙ্গে একবার গল্পগুজব করে এসেছি। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে বৌদি-ঠাকুরপো আখ্যান নিয়ে লিখেছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা"। বিভূতিভূষণ বছর দুই হরিনাভী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

সলিল চৌধুরীর পৈতৃক বাড়ি ছিল দক্ষিণ বারাসাত। তবে তিনি থাকতেন কোদালিয়ায় মামার বাড়িতে। তিনি হরিনাভী অ্যাংলো-স্যাংস্কৃট স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্তরে পাঠ শেষ করেছিলেন। তখনকার দিনে সারা

গাঁয়ে কোনো বাড়িতে একটা হারমোনিয়ামও ছিল না। একটা বাঁশের বাঁশী তিনি এনেছিলেন কলকাতা থেকে। সেটাই একটি পুলের ওপর বসে রোজ বাজাতেন। তাঁর ছোট দাদু ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর সেক্রেটারি। তাঁর মামার বাড়িটা প্রকৃতপক্ষে ছিল টেররিস্টদের আড্ডাস্থল।

তিরিশের দশকটাই সলিল চৌধুরীর কেটেছিল সোনারপুর অঞ্চলে। বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন হরিনাভী স্কুলের ছাত্র। ১৯০৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন রাজপুর। তাঁর স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের নিষেধ অগ্রাহ্য করে হাজির হয়েছিলেন সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অর্থাৎ মানবেন্দ্র নাথ রায় (এম এন রায়) সহ মোট ছয়জন এবং সকলেই স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। মানবেন্দ্র নাথ রায়ের জন্ম আড়বেলিয়ায় হলেও তিনি থাকতেন কোদালিয়ায়, পড়তেন হরিনাভী স্কুলে। এখানেই তিনি বিপ্লববাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একবার চাঙড়িপোতা স্টেশনে (বর্তমানে সুভাষগ্রাম স্টেশন) সশস্ত্র বিপ্লবীরা ট্রেন লুট করেছিলেন। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মানবেন্দ্র নাথ রায়। সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মস্থান কোদালিয়ায় না হলেও তাঁর বরাবর যাতায়াত ছিল সেখানে। মূলত তাঁরই প্রশ্রয়ে বিপ্লবীপন্থীদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল চাঙড়িপোতা। কোদালিয়ায় নেতাজির পৈতৃকভবন আজও অক্ষত আছে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ছিলেন অঘোরনাথ চক্রবর্তী (১৮৫২-১৯১৫)। সে যুগে ধ্রুপদ, ভজন, টপ্পা গানে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। "সঙ্গীত রত্নাকর" উপাধি পেয়েছিলেন তিনি। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লি দরবারে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য তাঁর ডাক পড়েছিল। সোনারপুর-এর ফিডার রোডটি তাঁর নামে হয়েছে "অঘোর সরণী"।

নেতাজীর পিতা জানকনাথ বসু কোদালিয়ায় জন্মগ্রহণ করলেনও তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছিল কলকাতায়, কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছিল উড়িষ্যার কটকে। তিনি যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হরিনাভী-রাজপুরের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের গভীর সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের তিনজন গৃহশিক্ষকের বাস ছিল হরিনাভী অঞ্চলে। এঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। হরিনাভী ব্রাহ্মসমাজের বহু অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসতেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উমেশচন্দ্র দত্ত ও শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রচেষ্টায় ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হরিনাভী ব্রাহ্মসমাজ। প্রতি ফাল্গুন মাসে এখানে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিতেন কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা। একবার এখানে এসেছিলেন কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। তিনি ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্তের ছাত্র ও ভক্ত। এখানে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রিস্টলের সমাধির আদলে একটি নকল সমাধিমন্দির আছে, যা দেখতে অতীব সুন্দর।

উমেশচন্দ্র দত্ত সেকালে একটি অসাধারণ কাজ করেছিলেন, যা হয়ত বাংলাভাষীরা ভুলে গেছেন। তাঁরই উদ্যোগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের ধারে খ্রিস্টান সিমেট্রির সম্মুখে। মাইকেলের শেষ দিনগুলি কেটেছিল দৈন্য দুর্দশায়। তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়েছিল অত্যন্ত অমর্যাদায়। উপরে কোনো বেদী বা স্মৃতিস্তম্ভ ছিল না। উমেশ চন্দ্রের উদ্যোগে যে অনুপম স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল তাতে উৎকীর্ণ রয়েছে মাইকেলের স্বরচিত সমাধিলিপি ঃ দাঁড়াও পথিকবর / জন্ম যদি তব বঙ্গে / তিষ্ঠ ক্ষণকাল / জননীর কোলে...।

অনেক কথা লেখা বাকি রয়ে গেল। বারান্তরে লেখার ইচ্ছে রইলো।

Vol : XV Issue : XI, 15th, February, 2026, PRABINBARTA Postal Regd. No.-Kol RMS/449/2025-27

আরব সাগরের বুকে অত্যাশ্চর্য গুহা ভাস্কর্য

সমীর কুমার ঘোষ

অল ইন্ডিয়া প্রসার ভারতী ক্রিকেট টুর্ণামেন্টে অংশ নিতে মুম্বাই গিয়ে টুর্ণামেন্ট শেষে ঠিক করি চল সবাই এলিফ্যান্টা গুহা দেখে আসি। দাদার থেকে সোজা চলে এলাম মুম্বাইয়ের "গেট ওয়ে অব্ ইন্ডিয়ায়", এখান থেকে ফেরি যোগে যেতে হবে এলিফ্যান্টা দীপে (Elephanta Island)। লঞ্চে আধ ঘণ্টার একটা সুন্দর সমুদ্র যাত্রা শেষে পৌঁছে গেলাম ৯ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পূর্বে নীল আরব সাগরের মধ্যে একটা ছোট্ট দ্বীপ এলিফ্যান্টায়। লঞ্চ চলাচল করে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তবে রাত ৮টার শেষ লঞ্চটি গেট ওয়ে অব্ ইন্ডিয়া থেকে ছাড়ে না, ছাড়ে এলিফ্যান্টা দ্বীপ থেকে। দ্বীপটি পর্তুগীজদের দখলে আসে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সুলতানকে যুদ্ধে হারানোর পর। ঔপনিবেশিক পর্তুগীজরা দ্বীপটির নাম রাখেন এলিফ্যান্টে— যেটি পরবর্তীকালে এলিফ্যান্টায় রূপান্তরিত হয়েছে। এমন নাম রাখার কারণ হিসাবে জানা যায় সেকালে একটি বিরাটাকার পাথরের হাতির মূর্তি ছিল গুহার কাছে। তাই এমন না। ১৮১৪য় ভেঙ্গে পড়া গাচি ১৮৬৪তে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে স্থানান্তরিত হলেও জোড়া লাগে ১৯১২য়। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হাতির মূর্তিটি এখন রাখা হয়েছে মুম্বাইয়ের জিজাবাই উদ্যানে। সে সময় শুটিং গ্যালারি বসত এলিফ্যান্টায়। এতে গুহার কিছু কিছু অংশ বিষেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ধ্বংস হয় পর্তুগীজদের হাতে। পরবর্তীকালে মুসলিম সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশদের হাতে এর অনেক কিছু ধ্বংস হলেও পরিশেষে ব্রিটিশ রাজত্বকালেই গুহাগুলির ক্ষয়ক্ষতি রোধ করে জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। দ্বীপটির নতুন নাম পর্তুগীজরা রাখলেও পূর্বে এটি পরিচিত ছিল ঘারাপুরী নামে কারণ, এখানে বেশ কিছু ঘরা ব্রাহ্মণদের বাস ছিল সেসময়।

লঞ্চ ঘাট থেকে ১২৫টি সিঁড়ি ভেঙে উঠে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে বহু আকাঙ্খিত গুহাগুলির অবস্থান। এ পথটুকু যাতায়াতের জন্য টয় ট্রেন রয়েছে। চলতে ফিরতে অসমর্থদের জন্য রয়েছে ঢুলি। আমরা পথশোভা দেখতে দেখতে মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে যাই গুহা মখে। সোমবার এলিফ্যান্টা বন্ধ থাকে। এলিফ্যান্টা হ'ল কতকগুলি গুহা মন্দিরের একটি সংগ্রহ যা প্রধানত: হিন্দু দেবতা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। দ্বীপটিতে মোট ৯টি গুহা রয়েছে যার সবকটি হিন্দু দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নির্মিত হলেও এস্থানে বৌদ্ধ স্তূপের দর্শন মেলে। এগুলি ২য় খ্রিস্টপূর্বের বলে মনে করা হয়। এমনকি এখানে দুটি বৌদ্ধ গুহা পাওয়া গেছে। দ্বীপটি ছোট হলেও অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ। পাথর কাটা গুহাগুলি খ্রিস্টিয় ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। কারও মতে পাহাড় কেটে ৪৫০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গুহা মন্দিরগুলি গঠিত হয়। আবার এও বলা হয় হিন্দু রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী এই গুহা মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিকদের একাংশ মনে করেন এলিফ্যান্টা গুহা মন্দিরগুলি কালচুরি রাজবংশের রাজা কৃষ্ণরাজের পৃষ্ঠপোষকতাতেই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল এবং তা সংগঠিত হয়েছিল

ষষ্ঠ শতাব্দর মাঝামাঝি কাল অবধি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজ বংশ দ্বারা একে এক এই অমূল্য সৃষ্টি সংগঠিত হয়।

এখানে এলে দেখা যায় শিলা শিল্পের (Rock Cutting) বা পাথর কুঁদে এক বিস্ময়কর শিল্প সংগ্রহ যা ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্প তার সবচেয়ে নিখুঁত অভিব্যক্তিগুলির মধ্যে অনবদ্য, বিশেষ করে প্রধান গুহার বিশাল উঁচু রিলিফ। গুহাটির প্রবেশদ্বার থেকে পিছনের দিক পর্যন্ত প্রায় ৩৯ মিটার দীর্ঘ। কেউ কেউ বলেন গুহাটির সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে ইলোরার ডুমা লেনা গুহার সাথে। যাতে ফুটে উঠেছে অসাধারণ ভাস্কর্য। বলা হয় আয়তনে ইলোরা অনেক বড় হলেও ভাস্কর্যে এলিফ্যান্টা অতুলনীয়।

এলিফ্যান্টা গুহামন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেব হলেন প্রধান উপাস্য দেবতা। তাঁকে উৎসর্গ করে গড়া হয়েছে প্রতিটি গুহা। গুহা ভাস্কর্যে জৈন প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে বলে মনে করা হয়। মোট ২৮টি সুদৃশ্য পিলারে ভর করে ৫০০০ বর্গমিটার জুড়ে বিস্তৃত সর্বমোট ৯টি গুহামন্দির রয়েছে এখানে। এর মধ্যে ৮টি পিলার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সে সময় প্রবেশদ্বার ছিল তিনটি যথা পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে। পুব পশ্চিমের পথদুটি পরিত্যক্ত হলেও বর্তমানে মুখ্য প্রবেশ পথটি রয়েছে উত্তরে। প্রতিটি গুহাতে রয়েছে শিবের বিভিন্ন ঘটনাবলির কাহিনী সম্বন্ধীয় প্রতিমূর্তি। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী প্রতিফলিত হয়েছে প্রতিটি মূর্তি অপরূপ শিল্পকলাতে। স্বল্প সময় স্থানীয় গাইডের সাহায্যে আমার চোখে যেমন ধরা পড়েছে তা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি যেমন গুহা (১) তান্ডবরত শিব বা নটরাজ যিনি নৃত্যের অধিপতি। মূর্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও শিবঠাকুরের মুখাবয়ব অক্ষত যা সত্যিই মনমুগ্ধকর। গুহা নং (২) অন্ধকাসুর বধ, দৈত্য সংহারে শিব এখানে রুদ্ররূপী চতুর্ভুজ দেবতা হিসাবে বিরাজ করছেন যাঁর মাথায় নরকঙ্কালের মুকুট। স্বর্গীয় বৃক্ষ চুরির অপরাধে এক হাতে অন্ধককে বধ করছেন স্বয়ং শিবসম্ভু। আবার অন্ধকের রক্ত মাটিতে পড়তে প্রতি বিন্দুতে এক এক দৈত্যের জন্ম এড়াতে আর এক হাতের পাত্রে রক্ত ধারন করছেন। তৃতীয় হাতে হস্তিচর্ম আর চতুর্থ হাতে খোলা তলোয়ার। গুহা নং (৩) শিব-পার্বতীর বিয়ের অনুষ্ঠান। রয়েছেন নারদ, কন্যাসহ পিতা হিমালয়— বাঁয়ে চন্দ্রের দেবতা সোমরস নিয়ে। লজ্জাবনত পার্বতী আরা সদাহাস্য শিব এক হাতে স্বীয় কটি বস্ত্র ধরে অন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পত্নী পার্বতীর দিকে। বসে আছেন বিয়ের অনুষ্ঠানের পুরোহিত রূপে স্বয়ং ব্রহ্মা আর ঠিক তার পিছে দণ্ডায়মান নারায়ণ, এ ছবি যেন সেই ঈশ্বরীয় ঘটনার সাক্ষী। গুহা নং (৪) গঙ্গাধর মূর্তি তথা স্বর্গ থেকে গঙ্গার মর্ত্যে অবরোহণ জটাজালে স্বয়ং শিব গঙ্গাধারণ করছেন। দুপাশে দুই সহচরী নদী যমুনা ও সরস্বতী। রাজা ভগীরথ উপবিষ্ট হয়ে শিবের ভজনায় রত। অন্যান্য দেবদেবী আকাশপথে এই আশ্চর্য ঘটনা নিরীক্ষণ করছেন। প্যানেলটি সত্যিই অপরূপ। গুহা নং (৫) এটি ৪০×৪০ মিটারের বেশ বড় গুহা। এখানে রয়েছেন মহেশ্বররূপে শিব। একটি বৃহৎ একশিলা পাথরকে কুঁদে ১৭.৯ ফুট (৫.৪৫ মি:) ত্রিমূর্তি সদাশিব (তিন মুখী শিব)। ভাস্কর্যটি সৃষ্টি রহস্যের তিনটি দিককে দেখানো হয়েছে অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। ডাইনে ব্রহ্মা, মাঝে বিষ্ণু আর বামে শিব। দ্বিমতে তৎপুরুষ বা তপুপুরুষ (মহাদেব) (কেন্দ্রীয় পূর্ণ মুখ), অঘোরা বা ভৈরব (বাম অর্ধেক) এবং বামদেব বা উমা (ডান অর্ধেক) শিবেরই এই তিন রূপ ত্রয়ী। ত্রিমূর্তির মাথার উচ্চতা ২ মিটার করে আর সম্পূর্ণ মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ মিটার। মূল

গুহার পাশে রয়েছে একটি ছোট গুহা। এখানে দেওয়ালে স্থান পেয়েছে অষ্টমাতৃকার মূর্তি যার দুপাশে রয়েছে— কার্তিক ও গণেশ মূর্তি। গুহা নং (৬) অর্ধনারীশ্বর। ৫ মিটার উঁচু অর্ধনারীশ্বর রূপে বিরাজ করছেন। বাঁদিকে সাপ হাতে শিব ও ডাইনে আয়না হাতে পার্বতী অর্থাৎ একদিকে নারী ও অপরদিকে পুরুষ। মাথার উপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্র-বরুণ, নিচে কার্তিক ও নন্দী। এবং নং (৭) কল্যাণ সুন্দর মূর্তি— মাউন্ট কৈলাসে মুখমণ্ডলহীন শিব যাঁর বামে পার্বতী ও ডাইনে নন্দী। এখানে শিব-পার্বতী পাশা খেলছেন। গুহা নং (৮) রাবণাগ্রহ মূর্তি— লঙ্কাধিপতি দানব দাম্ভিক রাজ রাবণ শিবকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে বাড়ি সমেত কৈলাস তুলছেন, পার্বতী ভীত আর নিস্পৃহ শিব পায়ের আঙুল দিয়ে ধরিত্রীকে চেপে রেখে বসে আছেন। রাবণের ব্যর্থতায় দেবতারা আনন্দিত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করছেন— নন্দী ও ভৃঙ্গী (শিব অনুচর) দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। গুহা নং (৯) যোগীরাজ— বামে নটরাজরূপী শিব, ডাইনে যোগীরূপী শিব। সৃষ্টির দেবতা চতুর্মুখী ব্রহ্মা, নিচে গণেশ। মূর্তিগুলির রূপ, মাত্রা, থিম, উপস্থাপনা, বিষয়বস্তু এবং যথার্থ সম্পাদনার জন্য যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি মূর্তির অনন্য ভাস্কর্য ও তাদের নান্দনিক স্থাপনা যেন ভারতীয় শৈল্পিক সৃষ্টির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যতদূর জানা যায় কোন এক বিশেষ রাজা বা রাজবংশের অর্থানুকুল্যে অত্যাশ্চর্য এই বিশাল গুহা কমপ্লেক্সটি গড়ে ওঠেনি। এই গুহামন্দিরগুলি গড়ে উঠেছিল ৫ম থেকে ৯ম শতাব্দর মধ্যে এ সময় বহু হিন্দু রাজা এ অঞ্চলে বাস রাজত্ব করেছেন। তবে, কিছু ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেন গুহাগুলি বিস্তার লাভ করেছিল ৫ম থেকে ৭ম শতাব্দর মধ্যে। আবার অন্য মতে এগুলি ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। পাথর কেটে গুহা প্রস্তুত করার দিনক্ষণ, তারিখ, বর্ষ ইত্যাদি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিস্তার মতভেদ থাকলেও গুহাগুলির বিন্যাস, সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভ এবং দেব-দেবীর বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে যে কমনীয় ভাবের সৃষ্টি সে মুখের ভাস্কররা তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময় সৃষ্টি করে। বিস্মিত হয়ে হয় একটি দীর্ঘ শৈল্পিক ঐতিহে কয়েক শত বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা নান্দনিক সৌন্দর্য্য ও সূক্ষ্ম ভাস্কর্যের প্রতিফলন ঘটেছিল গুহাগুলিতে।

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মতে গুহাগুলি প্রাচীনকালে অর্থাৎ ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। পর্তুগীজদের আগমনের আগে পর্যন্ত প্রধান গুহাটি হিন্দু উপসনালয়হিসাবে ব্যবহৃত হত। যার জন্য এই ছোট্ট দ্বীপটি উপাসনার একটি সক্রিয় স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। গুহাগুলির ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার প্রথম প্রচেষ্টা শুরু ব্রিটিশ আমলে ১৯০৯ সালে। ব্রিটিশ ভারতের কর্মকর্তারা একাজ শুরু করেন। ১৯৭০ এর দশকে স্মৃতিস্তম্ভগুলিকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। বর্তমানে এটি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

পরিশেষে, ভ্রমাণার্থীদের উদ্দেশ্যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা অবশ্যই বলব এলিফ্যান্টা গুহাগুলি সঠিকভাবে দেখতে হলে একজন গাইড নেওয়া অবশ্য কর্তব্য, না হলে আমাদের দেশের মহান শিল্পীদের নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলা সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের বহু কিছু অদেখা থেকে যাবে।

Vol : XV Issue : XI, 15th, February, 2026, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2025-27

আমার দাদা চিকিৎসক নরেশচন্দ্র শীল

চিকিৎসক জ্ঞানব্রত শীল

২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনেই আমার দাদা প্রয়াত ডাক্তার নরেশ চন্দ্র শীলের জন্মদিন। আমার দাদার সম্বন্ধে অনেক কিছুই লেখা যায়। তবে আমি সংক্ষেপেই লিখছি। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র, ব্যায়ামবীর, কবি, চিত্রকর, জনদরদী এবং জনহিতৈষী মানুষ ছিলেন। একজন ডাক্তার হিসাবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

আমার বাবার অসুস্থতার জন্য ১৯৫৪ সাল থেকে আমাদের বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব আমার দাদার ঘাড়েই পড়ে। তিনি নিজের ছেলে মেয়েদের সাথে সাথেই আমার MBBS পাশ করা ও চাকরি পাওয়া পর্যন্ত সংসারের সব দায়িত্ব পালন করেন। এর জন্য তিনি নিজের আরও উচ্চতর শিক্ষার ইচ্ছা দমন করেন। যার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

S. E .Rly-র ডাক্তার হিসেবে তিনি সর্বত্র রুগীদের প্রিয় ডাক্তার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে দাদা তখন উড়িষ্যার রাউরকেল্লা সংলগ্ন ছোট রেল কলোনি বান্ডামুন্ডার রেল হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। সেইসময় ওই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধে। বহু মানুষ মারা যায়। তার মধ্যে মুসলিমই বেশী ছিল। ছুরিকাঘাতে আহতের সংখ্যাই ছিল বেশী। দেখা যেত মুসলিমরা পেটের ক্ষতস্থানে হাত চেপে ওই অবস্থায় ছুটে চলে আসত দাদার কাছে। দাদা ওদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতো। ওই সময় রাত্রিবেলা যখন কেউ দাদাকে বাড়িতে রুগী দেখার জন্য ডাকতে আসতো তখন তার নিরাপত্তার জন্য থাকত দুজন বল্লমধারী লোক। যাবার সময় ও রোগী দেখে ফিরে আসার সময়ও তারা অবশ্যই সঙ্গে থাকত।

দাদা কর্মসূত্রে ১৯৬৮/৬৯ সালে বিহারের সিংভূম জেলার অন্তর্গত ডোঙ্গোয়াপসিতে থাকার সময় জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পে উৎসাহিত করার জন্য দ্বান্দ্বিক ছদ্মনামে ইংরেজি এবং বাংলায় সুন্দর দুটি কবিতা লিখে রেলের হাসপাতাল এবং অন্যান্য সরকারি অফিসের দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে ওই অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। এর ফলে অনেক মানুষ এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছিল।

এছাড়া দাদা খুব সুন্দর ছন্দমাত্রিক কবিতা লিখতেন। দাদার ছোট মেয়ে (ড. সুমিতা শিল রায়, রসায়নে পিএইচডি) খুব সম্ভবতঃ তার বছর ছয়েক বয়সে রাউরকেল্লাতে একটা বড় হলে (Hall) তার বাবার লেখা কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতাটির প্রথম দুটি লাইন ছিল 'তোমার ছবি নিত্য দেখি শুনি তোমার গান, দেখতে পেলাম না তাই রইল অভিমান...'। দাদার লেখা আর একটা কবিতা সেই অনুষ্ঠানে একটি বড় ছেলে পাঠ করেছিল। এছাড়াও দাদার লেখা অনেক কবিতা তার ছোট মেয়ে এবং ছেলে (ড. সুব্রত শীল, রসায়নে পিএইচডি) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছে।

আমাদের দাদা ছবি আঁকতে বেশ পটু ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ পেন্সিল স্কেচ করতেন। একবার ট্রেনে বসে কামরার আয়নাতে দেখে নিজের ছবি নিজের এঁকেছিলেন। ছবিটা এত নিখুঁত হয়েছিল যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাবার ছবি আঁকা দেখে তার ছোট মেয়েও জীবনে প্রথম ছবি আঁকতেশুরু করে।

আশা করি এই লেখাটার পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন যে আমার দাদাও একজন বড় মাপের জনহিতৈষী মানুষ ছিলেন।

একজন গানওয়ালের কথা

দিলীপ কুমার সিংহ

আমার চেনা একজন গানের শিল্পীকে যে কোন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার আগে কিছু কথা বলতে শুনতাম।

তিনি উপস্থিত যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলতেন— আগে নিজেদেরকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে। তারপর অন্য কাজে হাত দিতে হবে। তিনি বলতেন— আজও অনেক কুসংস্কার সমাজের বুকে চেপে বসে আছে। মুক্ত মনের চিন্তার আলোতে সে সব দূর করতে হবে। ছেলেমেয়ের বিয়ের আসরে মায়ের উপস্থিতি অশুভ। এই ধারণা সমাজের বুকে প্রচলন আছে। কারণ মায়ের নিঃশ্বাসে নাকি বিয়ের শুভ অনুষ্ঠান অশুভ হয়। এ প্রসঙ্গে কেউ সংবাদ দিতে পারেন কি বিয়ের আসরে মা উপস্থিত ছিলেন তাদের পরবর্তীকালে দাম্পত্য জীবনে কি কোন অঘটন ঘটেছে? এছাড়া বিয়ের আসরে বিধবা বা বাঁজাদের প্রবেশ নিষেধ। এর কোন যুক্তি আছে কি? এ সবই কুসংস্কার। এসব উদ্ভট চিন্তার অবসান হওয়া দরকার। অথচ ব্রাহ্মণ নির্দেশিত আচার-আচরণ মেনে বিয়ে হওয়ার পরেও বৈবাহিক জীবনে শান্তি বজায় থাকছে না। নিত্য বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা চলছে। সুতরাং সকল মানুষদের কাছে অনুরোধ এই বিষয়ে আপনারা সচেতন ও সজাগ থাকুন। যারা এসব প্রচার করেছেন তাদের বিষাক্ত জিভ বেঁধে রাখতে বলুন।

ইনি স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেকদিন আত্মগোপন করে ছিলেন। আজ ইনি মিত্রভাবাপন্ন সমাজ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন নিজেকে। তিনি বলতেন— মানুষের জন যাদের প্রাণ কাঁদে না তারা কি মানুষ। সমাজে যত যুবক ও যুবতীরা আছো— বীরের মতো বহন করো দায়। এরপর তিনি নিজের লেখা গান ও সুর করা গান করতেন। ওনার গানে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেত। দৈনিক সংবাদপত্রে ছোট্ট করে হলেও সংবাদটি প্রকাশিত হতো।

পরবর্তী সময়ে তিনি শুধু গান নিয়েই চর্চা করে গেছেন। গানের আসর ছাড়া অন্য কোন আসরে যেতেন না। এর কারণ সম্পর্কে নির্বাক ছিলেন। দার্শনিক ভাষণ দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি নিজের বাসগৃহে গানের স্কুল করেন। ওনার কাছে গান শেখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় জমতো। তিনি ভক্তিমূলক, ভজন, কীর্তন ও কবিতায় গীতিরূপ ও গান রচনা করতে লাগলেন। শনিবার ও রবিবার ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় চোখে পড়ার মতো।

বেশ কয়েক বছর পর বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ওনার গান লেখার চাতুরিটি। উনি বেনি না ভিজিয়েই অবগাহন, স্নান সেরে নিতেন।

গ্রাম-গঞ্জে অনেক দুঃখময় দরিদ্র মানুষ আছেন যারা সারাদিন নিজের রচিত গান গেয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও দু'বেলা ভরপেট খাবার জোগাড় করতে পারে না। উনি লোক মারফত টাকার বিনিয়ে

তাদের সন্ধান করতে লাগলেন। ওই গানওয়ালারা যারা খিদের জ্বালায় ঘুমোতে পারে না, তাদেরকে দালালরা নিয়ে আসে ওনার কাছে। উনি তাদের রচিত গান শুনে তা টেপরেকর্ডে বন্দী করে রাখতেন। এর জন্য টাকা পয়সাও দিতেন তাদেরকে বলে জানা যায়। এরপর তিনি তাদের সেইসব রচিত গানে কেবল দু-চার পোঁচ দিয়ে নিজেই গীতিকার হতেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজস্ব ঢঙে। এইসব গান গাইতেন (মানে রি-প্যাকেজিং) এতে ওনার শিল্পী হিসাবে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতে লাগলো। এরপর মেঘমুক্ত মানুষরূপে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ শুরু করলেন। তাদের সহযোগিতায় বিভিন্ন দৈনিক সংবাদ পত্রে নিজের সঙ্গীত সাধনার মনগড়া সংবাদ পরিবেশন করতেন। এর ফলে ওনার ঘরের লক্ষ্মী ভাণ্ডার উপচে পড়তে থাকে। সরকারি অনুষ্ঠানে ওনার ডাক পড়তে লাগে। অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার আগে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে আরম্ভ করতেন সংগীতে আছে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ, হয় দেবতার আরাধনা। সংগীতের শব্দতরঙ্গ নেচে নেচে কানের পর্দায় আঘাত করে তবেই তো সংগীতের সার্থকতা।

বিশ্বপ্রকৃতিকে ধরা হয়েছে সুরে-রাগে-রাগিণীর সমাহারে। তিনি প্রান্তিক মানুষদের গাওয়া গানকে ঘষা-মাজা করে নিজের সঙ্গীত বলে জাহির করতেন। সংগীত প্রেমিকদের হৃদয় জয় করতেন। তিনি হয়ে উঠলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ। মানবপ্রেমিক নাগরিক।

অন্যদিকে প্রান্তিক গান বাঁধা মানুষেরা তাদের প্রতিভার কোন মূল্যই পায় না। তারা দুঃখের দহনে তিলে তিলে ছাই হয়ে গানওলাদের মালা থেকে খসে পড়ে ওমোঘ নিয়তির কাছে। কেঁদেকেটে যায় সারাজীবন দু'মুঠো অন্নের জন্য। আর গান চুরি করা মানুষটি সগর্বে বেঁচে থাকে গানপাগল মানুষের মাঝে।

ধর্ম স্বীকৃতি এক ধর্মীয় আপদ

তপন কুমার দাস

ভারতে ধর্ম নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রবল। তাকে সংহত করার চেষ্টা হয়নি। বরং দায়িত্বহীন রাজনীতির দলগুলো তাকে উসকে দেবারই চেষ্টা করছে। ধর্ম ব্যাপারটাকে নিছক ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার যাবতীয় চেষ্টাই যখন ছিল প্রয়োজন, যাতে করে ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়টি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে, তা না করে ধর্মকে সমাজ ও রাজনীরি মধ্যে নাক গলাতে দিতে গিয়ে এখন সীমাহীন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ধর্ম মানুষকে বহু ভাবে বিভক্ত করেছে। এই বিভাজন এক দূর অপনেয় সমস্যা হয়ে উঠেছে। তাকে কঠোর ভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়নি। এখন আবার এক নতুন ধারা দেখা দিচ্ছে— নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পৃথক ধর্ম সম্প্রদায় হিসাবে স্বরাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি। কংগ্রেস দল সঙ্কীর্ণ লক্ষ্য থেকে কর্নাটকে সে কাজে অগ্রণী হয়ে এক নতুন সমস্যার জন্ম দিল। দেখা গেল লিঙ্গায়েৎ নিয়ে ভোটের কুৎসিত খেলা। স্বীকৃতির উপর ধর্মীয় আচরণ নির্ভর করবে কেন? ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই বা সে কাজে হস্তক্ষেপ করতে যাবে

কেন? ধর্ম একটা সম্প্রদায়গত অস্তিত্ব নিয়ে সাধারণত আবির্ভূত হয়। পরে কোন কোন ধর্ম বিস্তার লাভ করে। কখনও রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে ক্ষমতার জন্য দ্বন্দ্ব, কখনও রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা পথে ধর্মকে তার সীমায় ঠেলে দিয়েছে। রাষ্ট্র তার সঙ্গে সম্পর্করহিত। কাজেই ধর্মীয় গোষ্ঠী যে ভাবে খুশি অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। তা ক্রমে লুপ্ত হয়েও যেতে পারে। হাজার হাজার ধর্ম পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গেছে। লুপ্তপ্রায় ভাষা বা জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হতে পারে ধর্মকে রক্ষা করা নয়। ধর্মকে কোনও রকম সাহায্য করাও নয়। পাশ্চাত্য ধর্মকে সেই ভাবে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

কর্নাটকের লিঙ্গায়েৎ গোষ্ঠী এক আন্দোলন করে তাদের পৃথক ধর্ম গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতির দাবি করে। তারা হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হোক না হোক সেটা তাদের ইচ্ছা। সরকার কী মনে করলে তা দিয়ে কী এসে যায়। সরকার কী ধর্ম বিচারে অধিকারী? কিছু ধর্মীয় সুবিধা যদি সরকারের দেবার থাকে তা অবশ্যই বন্ধ করা দরকার। অমরনাথের যাত্রারর নিরাপত্তা বিধান সরকার করতে পারে। কিন্তু তাদের সব ধর্মের ও নাস্তিকের টাকায় তীর্থ-ভাতা দিতে পারে না। সরকার হজ গমনের পরিবহন নিয়ে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু সরকার হজ হাউস বানাতে পারে না, কোনও ধর্মের নামেই কোনও অর্থ ব্যয় করতে পারে না। সেটা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়।

তা ছাড়া নতুন নতুন ধর্ম যদি সরকারি স্বীকৃতির রাস্তায় আগমন শুরু করে, তার শেষ কোথায়' কিছুদিন আগে এইখানে একটি মিছিলকরে, রাস্তা অবরোধ করে 'সারনা' নামে একটি গোষ্ঠী ধর্মীয় স্বীকৃতির দাবি করে। সারনার পক্ষে দাঁড়িয়ে ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির নেতৃত্বে আদিবাসীরা দশদফা দাবি তুলে ধরে। বলাই বাহুল্য যে এমন অনেক গোষ্ঠীই থাকতে পারে তাদের নিজস্ব রীতিনীতি অনুসরণ করে। তারা এটাই ধর্মীয় আচরণ মনে করে। আদিবাসী গোষ্ঠী অনেকেই আদিম ধর্মীয় ধারা অনুসরণ করে থাকে। এই সব কিছু ভারতীয় ধারা মিলেই হিন্দু ধর্ম।

কোনও কারণেই ধর্ম ভিত্তিক আইন বা ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সুযোগ থাকাই উচিত নয়।

তামিলনাড়ুতে আয্য ভাইকুন্দরের অনুগামীরা নিজস্ব ধর্ম পরিচয়ের স্বীকৃতি দাবি করেছে। তারা বলেছে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের নিজস্ব ধর্মীয় মন্দির আছে। নিজস্ব আচার-আচরণ আছে।

আয্য ভূইকুন্দর ২১০ বছর আগে ত্রিবাঙ্কুর শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তার আবির্ভাবকে অনুগামীরা সাক্ষাৎ নারায়ণের আবির্ভাব বলে মনে করা হয়। তাঁরই অনুগামীরা 'আয্য' সম্প্রদায় বলে পরিচিত হয়। সারা ভারতে এমন এক একজন প্রভাবশালীর অনুগামী সম্প্রদায় অনেক আছে। যেমন হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামী মতুয়া। এই রকম সম্প্রদায় যেমন আছে তেমনি প্রচলিত ধর্মের ভিতরও অনেক রকম উপসম্প্রদায় যারা নিজস্ব ধারায় ধর্ম পালন করে। তারা কখন কে পৃথক ধর্মের দাবি করবে তা বলা শক্ত।

আসলে ধর্মকে ধর্মের মতো থাকতে দিলে কোনও কথা নেই। এটাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্রের কাছে ধর্মের কিছু প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। তাদের তো প্রার্থনা, স্বীকৃতি, দাবি সব কিছু করার জন্য দেবতারা বসে

আছেন। রাষ্ট্র তাকে মানল কি মানল না তাতে কী হল? এই অবস্থানে আমাদের দেশ নেই। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আকাশ পাতাল ফাটিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু কাজে সর্ব ধর্ম ত্রাতা হয়ে এগিয়ে আসে। এখানে তো আরও নিচু স্তরের ধর্ম চর্চা সরকারের দ্বারা হয়ে চলেছে। রাস্তায় এখন শনি মন্দির বানাচ্ছে সরকারি দলের কর্মীরা, জনগণকে কাছে পেতে। হনুমান পূজা বাঙালি কস্মিন কালেও করেছে বলে শোনা যায়নি। সরকারি দল করার প্রতিযোগিতায় অবাঙালিদের হারিয়ে দিচ্ছেন। ছোটদের জন্য রথ বানাবার প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হচ্ছে।

ভাষার অপমৃত্যু

নবকুমার কর্মকার

সংবাদ মাধ্যমের দরজা খুললেইদেখতে পাই বাংলা বাযায় কথা বলার জন্য ভিনরাজ্যবাসী বাঙালিকে কোথাও শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে, কোথাও মোটা অঙ্কের জরিমানা আদায় করা হচ্ছে, কোথাও বা প্রাণে মেরে ফেলা হচ্ছে। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দেখানোর পরেও রেহাই পাচ্ছে না বাংলাভাষীরা। পাঁচ বছর আগেও এসব ছিল না। মধ্য ও উত্তর ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে জাতপাতের বৈষম্য, ধর্মান্ধতা ছিল, আজও আছে। উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণের মানুষরা নিম্নবর্ণের দলিতদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। বাবাসাহেব আম্বেদকর যিনি এই দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি, যিনি সারাজীবন এই মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনকে সঙ্গী করে বেঁচেছেন। তাঁই হয়তো তারই প্রতিবাদে জীবনের শেষ প্রান্তে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একে ধর্মত্যাগ বলা যাবে না। হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতাকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। বলা ভালো হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এ তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তাই বলে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধাচারণ করে যাঁরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছে, তাঁরা এই দলে পড়েন না। কারণ তাঁরা হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই না করে শুধুমাত্র ঈশ্বর নিরাকার বলে সুপ্রাচীন কৃষ্টি, সংস্কৃতি ঐতিহ্যসমন্বিত ধর্মকে ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। সে সময় শহুরে শিক্ষিত একশ্রেণির মানুষের সমর্থন হয়তো তাঁরা পেয়েছেন, কিন্তু তাকে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করা বলে না। তাই ভারতের মাটিতে এই ধর্মের শিকড় গভীরে প্রোথিত হয়নি।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা যখন জাতীয়তাবাদের কথা বলি, ধর্মনিরপেক্ষতার উদাহরণ দিই, সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়াই তখন তাতে আমাদের দোষের বিন্দুমাত্র স্খলন হয় না। বরং অপরাধী বলে মনে হয়। তাই যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম আজ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সরকার সুপরিকল্পিতভাবে একটি ভাষার অপমৃত্যু ঘটানোর জন্য নানা ধরনের অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের শাসিত রাজ্যগুলোতে। শুধু তাই নয় বাংলাভাষী অপবাদ দিয়ে, বাঙলাদেশী প্রতিপন্ন করে জোর করে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের

পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনা কখনো দিল্লী, কখনো মহারাষ্ট্র, কখনো বা যোগীশাসিত উত্তরপ্রদেশে। বিজেপি শাসন কায়েম হওয়া উড়িষ্যায় এই সমস্যা আরও প্রকট। তাই একটা সোনালী বা একটা রহমত নয় বাংলা ভাষাভাষী অপবাদে শুধু হেনস্থা নয়, সুপরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষার অপমৃত্যু ঘটানোর অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। এর প্রতিবাদে রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান, দলমত নির্বিশেষে (গোঁড়া ধর্মান্ধদের বাদ দিয়ে) সমস্ত মানুষের সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে।

২৮ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত পিকনিক সম্পর্কে রিপোর্ট

২৮ জানুয়ারি ২০২৬ বুধবার সংস্থার পক্ষ থেকে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। নরেন্দ্রপুর, মিশনপল্লী অঞ্চলে একটি বাগান বাড়িতে পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ির ভিতর প্রচুর গাছপালা, ফুলের বাগান, দুইটি মাঠ এবং পুকুর সহ সুন্দর মনোরম পরিবেশ সবাই উপভোগ করেন।

সংস্থার সদস্য, শুভানুধ্যায়ী, বাসের স্টাফ সহ মোট ৬৯ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২/৩ ভাগ মহিলা, ৭৫ উর্দ্ধ ২০-২৫ জন এবং ছোট বাচ্চারাও অংশ গ্রহণ করেছেন। অনেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সংস্থার পিকনিকে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলেন।

সকাল ৯ টায় বেথুন ইন্সটিটিউটের সম্মুখ থেকে ২টি বাস ছাড়া হয় এবং সকাল ১০ টায় গন্তব্যস্থানে পৌছায়। বাস থেকে নামার পরই টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জি. এম. আবুবকর। তিনি ওই এলাকার ইতিহাস তুলে ধরেন। পরবর্তীতে কিছু প্রশ্ন রাখেন এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে উত্তর আহ্বান করেন। যারা সঠিক উত্তর প্রদান করে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করেন।

গৌতম রায় চৌধুরীর সঙ্গীতের মাধ্যমে সঙ্গীতানুষ্ঠানের শুরু হয়। পরবর্তীতে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন সীমা চ্যাটার্জী, শিপ্রা সোম, অঞ্জলী অধিকারী।

সচ্চিদান্দ চৌধুর বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান উপদেশমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। সপ্তসুর এর শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত ও আবৃতি পরিবেশন করেন। তারা হলেন— মঞ্জু সাহা, টুটু বোস, অঞ্জলী অধিকারী, পরিচালনায় শ্যামলী ঘোষ। তা ছাড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বীণা ভট্টাচার্য, সঙ্গীতা দাস, স্বপ্না মুখার্জী, সীমা চ্যাটার্জী, পুষ্পিতা দাশগুপ্ত, গীতা দত্ত প্রমুখ। সমগ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন গৌতম রায় চৌধুরী। পরবর্তীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য অনুষ্ঠানের বিরতি ঘোষণা করা হয়।

বিরতির পর নারায়ণ দাস ও গৌতম রায় চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় খেলাধুলার অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্নেহাংশু চাকদার বেথুনের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, শনিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিসব উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা

হবে। বিগত বছরগুলোতে আমরা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রদের মধ্যে স্কুলব্যাগ, খাতা, কলম, পেন্সিল সহ পঠন সামগ্রী বিতরণ করে আসছি। এবছও স্কুলগুলোর সাথে যোগাযোগ করে এ ধরনের অনুষ্ঠান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন। তাই আপনাদের সকলের কাছে আবেদন আপনারা এ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন।

তা ছাড়া আগামী ১৩ মার্চ ২০২৬ শুক্রবার ডা. নর্মান বেথুনের জন্মদিন ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ২৪ মার্চ ২০২৬ মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী এবং হরিদাস মালাকার স্মরণে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে।

বর্ণিত অনুষ্ঠানগুলোতে আপনাদের উপস্থিত থাকার জন্য সদয় আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

সবশেষে পিকনিকে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শেষে করেন।

পরবর্তীতে খেলাধূলার আয়োজন করা হয়।

প্রথমে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন প্রতিযোগিতায় ২৪জন অংশগ্রহণ করেন। ৮টি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রথম হন - গীতা দত্ত ও চন্দ্রা রক্ষিত এবং ৭টি মোমবাতি জ্বালিয়ে ২য় হন - স্বপ্না মুখার্জী ও কোয়েল মণ্ডল। পরবর্তী বিষয় ছিল বল থ্রো - ২২জন অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে শ্রাবণী দাস, গৌতম চক্রবর্তী এবং সুশান্ত দাস নির্দিষ্ট পাত্রে বল ফেলতে পেরেছেন। সবশেষে Musical Chair - তাতে ১৯জন অংশগ্রহণ করেন। তাতে প্রথম হন অদিতি নন্দী, ২য় হন মানসুরা খাতুন এবং তৃতীয় হন মিলু মাইতি।

ঘোষণা করা হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগিদের আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

সবশেষে গৌতম রায়চৌধুরীর পরিচালনায় সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি সকলে খুব উপভোগ করেন। অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য-সদস্যাবৃন্দ সুষ্ঠভাবে আয়োজনের ব্যবস্থা করার জন্য সংস্থার খুব প্রশংসা করেন।

সর্বপরি সিদ্ধান্ত হয় আগামী বছর আবার হবে - এটাই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস।

বাস্তুত্যাগী

অনুলেখন : তপন কুমার দাস

নানাকারণে মানুষ তার চিরনের বাস্তুভিটা, জমিজমা সব কিছু ফেলে অজানা আশ্রয়ে জন্য বেরিয়ে পড়ে। চিন দেশে এক প্রবল প্লাবণে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের সকল বাস্তুহারা লোক শহরে আশ্রয়ের আশায় যাত্রা করেছিল। এরা সকলেই সর্বহারা, কপর্দকহীন। এদেরই মধ্যে ছিল সন্তানহারা কপর্দকহীন এক বৃদ্ধ। সে তার

শিশু নাতিটিকে প্রাণে বাঁচিয়ে বাঁকে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাঁকের একটি ঝুড়িতে ছিল ছেড়া কাপড়ে মোড়া একটি ছোট্ট ক্ষীণ মানবসন্তান— বৃদ্ধের নাতি। বৃদ্ধ শ্রান্ত ক্লান্ত ও শীর্ণ। আর ভার বইতে পারছিল না। তাই এক দোকানের কাছে বিশ্রাম নিতে বাঁক নামাল। দয়া ভরে এক পথিক বৃদ্ধকে খেতে একটি রুপোর টাকা ও পরে একটি তামার মুদ্রা দিল। ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ তামার পয়সা দিয়ে কিছু নুডল কিনে শিশু সন্তানটিকে খাওয়াল। বাটিতে লেগে থাকার খাবার সে চেটে খেয়ে তৃপ্ত বোধ করল। রুপোর মুদ্রা সে খরচ করল না। নিজে কিছু খেল না— মুদ্রাটি সযত্নে রেখে দিল শুধু বীজ কেনার জন্য। এই বীজ তার জমিকে শস্যশ্যামল করে তুলবে তার ও তার বংশধরের অন্নবস্ত্র জোগাবে। নতুবা ভবিষ্যত বলতে আর অবশিষ্ট কিছু থাকবে না। জমি ও বংশধর নাতিটির প্রতি কৃষকের আসক্তি ঘটনা প্রবাহ। পার্ল বাক নামে এক আমেরিকার মহিলা এই গল্পের লেখিকা। চিনের কৃষকজীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। তারই ভিত্তিতে লেখা Good Earth উপন্যাসটি সাহিত্যে Nobel Prize অর্জন করেছিল।

অনুশোচনা

পারিজাত রক্ষিত

ছোটো বাবা, বলে তারস্বরে
ডাকলো মোরে জ্যাঠাই,
মুঠো ফোনটা ঠিক করে দে
দেবো হাওয়াই মিঠাই।

দু-চারবার শিখিয়ে শেষে
বললাম শোনো বুড়ো,
এ সব তোমার কম্ম নয়
বৃথা চেষ্টা, তুমি ছাড়ো।

করুণ চোখে থাকেন তিনি
তাকিয়ে আমার পানে,
বুঝিনি আমি ঘুণাক্ষরেও
না-বলা কথার মানে।

ছেলেবেলার সে ছায়াসঙ্গী
আর ডাকে না, তো মোরে,
প্রবল জ্বরে পাথর হলো
বসন্তের এক ভোরে।

আজ যে আমি দশম শ্রেণী
তোমার তরে ব্যাকুল,
হে ঈশ্বর, ক্ষমা কোরো মোর
সে দিনের মস্ত ভুল।

কে যেন ডাক দিলো সহসা
সেই চেনা নাম ধরে,
ছুটে গিয়ে দেখি শূন্য ঘরে
স্মৃতি তার আছে পড়ে।

বোঝা নও, বোঝা বয়ে যাও

শ্যামলী সিংহ

নারী, তোমার জীবন কাটে
পিতা, পতি, পুত্রের সংসারে,
নিজস্ব ঠিকানা কিছু নেই।
অবিবাহিতা, বিবাহিতা বা বিবাহবিচ্ছিন্না
যাই হওনা কেন, কর্তব্য-দায়িত্ব যতই থাক না,
সমাজ তোমার দিকে আঙ্গুল তোলে—
বাপের ঘরের বোঝা হয়ে অন্ন ধ্বংস কর।
স্বামী মানুষ কিংবা অমানুষ - সংসারটাকে
নিজের কর, শুক্‌নো গাছে ফুল ফোটাও।
তোমায় ছাড়া তার রান্নাঘর চুলার উত্তাপ পায় না।
প্রাণ পাত করে সন্তানকে বড় কর,
উচ্চ শিক্ষা দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত কর
সমাজে-সময় সেও সংসারী হয়,
তুমি ও ধীরে ধীরে সেখানে ব্রাত্য হও।
শুধু উচ্চশিক্ষা নয়, একটু সুশিক্ষারও প্রয়োজন,
হয়তো তবে তোমার এ দশা হত না।
প্রতিটি সংসার তোমার অবদান করে
অস্বীকার— তকমা দেয় তোমায় 'বোঝা'।
ওদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলে
বুঝবে— তুমি তো বোঝা নও
তুমি সংসারের বোঝা বয়ে যাও।

P.R.C. জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন
পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)
১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - বুধবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০
নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Tapan Kumar Das on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 9830933834 / 9674553477 and Printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Tapan Kumar Das.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in